প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণবতা তথা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলার উৎস সন্ধান : লৌকিক প্রণয় ভিত্তিক কাব্যধারণার অলৌকিক ভাবলোকে উত্তরণের পথরেখা নিরীক্ষণ ।

প্রেম মানুষের মৌল প্রবৃত্তি । বাস্তব সংসারে এই প্রেমের অর্থ গভীর ও ব্যাপক । মানুষের এই বিচিত্র প্রেমই সাহিত্যের অন্যতম বৃত্তি । কবে কোন্ কবি পৃথিবীর প্রথম সংগীতটি রচনা করেছিলেন তা আমরা জানি না । তবে সেই প্রথম সংগীতে নিশ্চয়ই নর-নারীর বিচিত্র প্রেমের, মর্তের গানের স্পর্শ ছিল — এ কথা বলেন হয়তো বেশী বলা হবে না । প্রেমের অর্ঘ্যেই তৈরী হয়েছে দেবতা । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

''এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নর নারীর মিলন বেলায়,
কেহ দেয়, তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায় ।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে — প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা;
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ॥''

(''বৈষ্ণব কবিতা'' / সোনার তরী)

সাহিত্যের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মনে রেখে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করা যেতে পারে । ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত ''শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ - দর্শনে ও সাহিত্যে'' গ্রন্থে রাধা - কৃষ্ণ প্রেমের বিকাশের একটা পথরেখার নির্দেশ দিয়েছেন । মোটামুটি ভাবে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তিনি রাধা - কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক কবিতার আলোচনা করেছেন । পার্থিব প্রেম কবিতাই যে একদিন অপার্থিব বৃন্দাবনে যাত্রা করেছে — একথা প্রচুর যুক্তি সম্মত প্রমাণ সহযোগেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । আমাদের আলোচনায় ডঃ দাশগুপ্তের বক্তব্যকে যোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে । বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারনাকে ভেঙেগ দিয়ে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেছেন —
''বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণভাবে এই একটা সংস্কার আছে যে, বৈষ্ণব কবিতার মূল প্রেরণা ধর্মের মধ্যে; ধর্মের প্রেরণাই সাহিত্য সৃষ্টির ভিতরে রস-বৈচিত্র্য এবং রস - সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । চৈতন্য - যুগের বৈষ্ণব - সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এই জাতীয় একটি সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আমরা যদি

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের কবিগন কর্তৃক রচিত সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতা গুলি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য প্রেরণাই সেখানে আসল কথা।... ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়ারূপে আভীর জাতির ক্ষুদ্র-পরিধি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রসজ্ঞ কবিগন সেই নবলব্ধ বিষয় বস্তুকেই তাহাদের কাব্যসৃষ্টির ভিতরে একটু আধটু স্থান দিয়াছেন।

-(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ৩য় সং, পৃ: ১৪৪ - ১৪৯)

প্রাচীন ভারতীয় কবিগনের বিবিধ কোষগ্রন্থ থেকে লৌকিকপ্রেমের অলৌকিক পথে যাত্রার স্বরূপটি সংক্ষেপে জানা যেতে পারে। পুরাণ - উপপুরাণ, শ্রুতি - স্মৃতিতে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের প্রামাণিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একমাত্র ভাগবত পুরানের প্রধানা গোপীকে আমরা সহজেই রাধা বলে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু সেখানেও রাধার উল্লেখ নেই। কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা ও মাধুর্য্যই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গোপীর নাম তামিল গানে 'নাপিন্নাই'। এই নাপিন্নাই আবার লক্ষ্মীর অবতার। ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত সন্দেহ করেছেন স্থানীয় প্রেমগাথার সাথে পৌরানিক প্রধানা - গোপীর ধারণা ভক্ত কবিগন সমভাবে গ্রহণ করেছেন তাদের রচিত কৃষ্ণ-প্রেম গীতি রচনায়।

যাহাহোক, আমরা প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাই প্রাকৃত কোষ গ্রন্থ 'গাহা সও সঈ'তে গ্রন্থটির সংকলন কর্তা সাতবাহন রাজা হাল। 'গহা সওসঈ'র গাথা গুলো খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই রচিত ও বহুল প্রচারিত। এই সংকলন গ্রন্থের বহু কবিতায় অনুরাগ, অভিসার, বিরহ যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় এই কবিতাগুলো পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে।

একটি মাত্রপদে স্পষ্ট ভাবে রাধার উল্লেখ করা হয়েছে —

''মুহ মারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহি আএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বলবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি ॥ ১।৮৯

(''হে কৃষ্ণ তুমি মুখ মারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখমণ্ডল মুখলগ্ন) গোরজ অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগনের ও অন্য সকল নারীগনেরও গৌরব হরণ করিতেছ''))।

বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদে প্রিয় প্রতীক্ষায় উৎসুকা রাধিকার মনোভাবের কাব্যিক উপস্থাপনার সঙ্গে গাথা সপ্তশতির একটি গাথার তুলনা করা যাক। বিদ্যাপতির পদ —

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচ যুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্বে।
(শ্রীহরেকৃষ্ণ — বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১২৯)

মনে হয় উক্ত কবিতাটি এবং বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুরূপ পদগুলি নিম্নোদ্ধৃত গাথা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

রাচ্ছাপহিল্লণ অণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম্।
দারণিহিএহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গল কলসেহিঁ ব থণেহিঁ॥
২/৪০

("তোমাকে আসিতে দেখিয়া সে সকল মঙ্গল আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার নয়নোৎপলের দ্বারা সে তোমার আগমন-পথ প্রকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার দুইটি স্তনকে দ্বারনিহিত দুইটি মঙ্গলকলস করিয়া রাখিয়াছে।" — ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ)

অনুরূপ শ্লোক "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" ও "কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ঃ" — এও পাওয়া যায়। সদ্যস্নাতা যুবতীর অটুট যৌবন-লাবণ্য, স্তনপটের উপরে শোভিত মণিহারের বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর এক বড় সম্পদ।

গাথা সপ্তশতী থেকে একটি গাথার উল্লেখ করে আমরা দেখবো যে, অনুরূপ বর্ণনার কুশলতার দিক দিয়েও বৈষ্ণব কবিরা প্রাচীন কবিদের উত্তর সাধক।

মগ্গং চিচ্চঅ অলহন্তো হারো পীণুন্নআণঁ থণআণং
উব্বিগ্গো ভমই উরে জমুণাণই ফেণ পুঞ্জোব্ব॥ ৭।৬৯

("পীনোন্নত স্তন যুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ন্যায় বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" — ডঃ দাশগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ)

তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ —

পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মতিমহার ।
জানি কনকাচল উপরবিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥

তুলনীয় বড়ু চণ্ডীদাসের পদ —

গিএ গজমুতী হার মনি মাঝে শোভে তার
উচ্চ কুচ যুগল উপরে ।
হরা সমান আকারে সুরেশ্বরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥

ধ্বন্যালোকের কবি আনন্দবর্দ্ধন অমরুর প্রেম কবিতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন । সুতরাং বলা যায়, অমরুর প্রেম কবিতার কাল নবম শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে । তার প্রাকৃত প্রেমের কবিতাগুলো যেন বৈষ্ণব-পদাবলীর হুবহু পূর্বরূপ । একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করা যাচ্ছে —

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ ।
পঢ়ম বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও ॥ ৩।৪

তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ —

কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল ।
লিখইতে কালি ভীতভরি গেল ॥
ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ ॥

তুলনীয় চণ্ডীদাসের পদ —

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু' আঁখি হইল অন্ধ ॥

রূপ গোস্বামীর 'পদাবলী'তে অমরুর পদ স্থান লাভ করেছে । বুঝতে অসুবিধা হয় না এককালের এই সব প্রেম কবিতাই পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের কবিতায় রূপলাভ করেছে ।

আনুমানিক দশম শতাব্দীর সংস্কৃত কোষগ্রন্থ ''কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়''— এ বৈষ্ণব পদাবলী সুলভ রস, ভাব, প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এই আদর্শই পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব কবিকুল বরণ করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। একটি পদের উল্লেখ করা যাক —

মার্গে পঙ্কিনী তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতি মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্ ।
আজানুদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ পদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ॥ (৫১৯ শ্লোক)

এই পদের ভিত্তিতেই গোবিন্দদাসের অনবদ্য **অভিসার** প্রভৃতির পদ গড়ে উঠেছে —

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি ।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

'সদুক্তি কর্ণামৃতে' রাজশেখর কৃত একটি শ্লোকে নবযৌবনা নারীর যে সব পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলীতে তা সুলভ।

পদভ্যাং মুক্তস্তরল গতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণী বিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচ সচিবতাম দ্বিতীয়ং চ বক্তুং
তদ্‌গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন ।২।২।৪

তুলনীয় বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃ সন্ধির পদ —

সৈসব জৌবন দরসন ভেল ।
দুহুপথ হেরইত মনসিজ গেল ॥
মদনক ভাব পহিল পরচার ।
ভীন জন দেল ভীন অধিকার ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব ।
একক খীন আওক অবলম্বন ॥ ইত্যাদি ।

শ্রীধর দাসের এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল। ''গীত-গোবিন্দ'' ও ''কৃষ্ণকর্ণামৃত''ও এই সময়ের রচনা বলে ধরা হয়। এই সময়ে প্রেমকাব্যে কৃষ্ণকথা বিশেষভাবে স্থান করে নেয়। এতদিন 'অসতীদের

কবিতায়' রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের সমতুল কবিতা গুলো স্থান পেয়ে এসেছে। নর ও নারায়ণের প্রেমের মাঝে তেমন কোন ভেদই ছিলনা। দ্বাদশ শতকে এসে রাধা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে একটি পূর্ণকাব্য লেখা হলো — জয়দেবের ''গীতগোবিন্দ''।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচনা করেন ''কৃষ্ণকর্ণামৃত''। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে ''গীতগোবিন্দ'' ও ''কৃষ্ণ কর্ণামৃত'' এর গুরুত্ব যথেষ্ট। চৈতন্য চরিতামৃতে পাচিছ বিল্বমঙ্গল, জয়দেব এবং বিদ্যাপতির কাব্য ও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

''কর্ণামৃতবিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
দুহে শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥
(শ্রীঃ চৈঃ অন্ত্য ১৫/৫৫৪)

'লীলাশুক' এই নামের মধ্য দিয়েই বৈষ্ণবভক্তের মানসিকতা প্রকাশিত। মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতকে এসে প্রাকৃত প্রেমগাথা বা লক্ষ্মী ও হর-গৌরী বন্দনা সংগীত ক্রমেই কৃষ্ণকথার আধিপত্য স্বীকার করে, যদিও গীত-গোবিন্দে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত নয়। জয়দেব ও মধুর রসের কাব্যরচনা করতে বসে কমল নয়ন, ভব-বন্ধন - মোচনকারী, অনন্তশয্যায় শায়িত, রাম রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছেন। কিন্তু তবু শেষ-পর্যন্ত তাঁর কাব্যে মধুর রসেরই জয় হয়েছে। জয়দেব তাঁর কাব্যপাঠককে উদ্দেশ্য করে যে উক্তি করেছেন তাতে বলা চলে কবিতার সমসাময়িক ও অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী কবিদের প্রাকৃত প্রেমগাথার প্রেমকেই গ্রহণ করেছেন তাঁর নব - সৃষ্ট রাধা - কৃষ্ণ প্রেমের কাব্যে।

''যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥'' (১মঃ সর্গ, ৩য় শ্লোক)

জয়দেব কবি কৃষ্ণ নামকে অনেক স্থলেই রূপসী নারী বা অলংকার রূপে বর্ণনা করেছেন। ভক্ত কণ্ঠের মধুর হরি — নাম যেন কণ্ঠলগ্না প্রিয়া। সুতরাং একথা বলা খুব অযৌক্তিক হবে না যে, রাধাপ্রেমের আদর্শ জয়দে-বের সময়ে ঠিক গড়ে উঠেনি। এর একটি প্রধান কারণ হচেছ, এই সময়ের লৌকিক প্রেম কবিতার ব্যাপক প্রভাব। প্রাকৃত প্রেমের অনুষঙ্গেই

জয়দেবের রাধা – কৃষ্ণ ভূমিকা । তাছাড়া জয়দেব অন্যান্য কবিদের মত কিছু প্রেম গাথাও রচনা করেছিলেন । শিব – পার্বতীকে নিয়েও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের প্রায় প্লাবন বয়ে গেছে । সুতরাং হরিকে স্মরণ করতে বসে জয়দেব কবিও পূর্ব ঐতিহ্যকে ভুলতে পারেননি । কিন্তু একথা ভুল্লে চলবেনা যে ''গীতগোবিন্দ'' কাব্যে শ্রীরাধাকে পরিপূর্ণভাবে প্রথম পেলাম আমরা । দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্যের কারণ কি ? ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এর দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন । ''প্রথমতঃ সেন রাজাগনের পারিবারিক ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; আর দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলা এবং বৃহত্তর বাঙলার কবি-গোষ্ঠীর ভিতরে সেন রাজাগনের প্রভাব অনস্বীকার্য । দ্বিতীয়তঃ ''রাধাকৃষ্ণের রাখালিয়া প্রেম কবিতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল এবং লীলা বৈচিত্র্যেও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল । এই লীলা অবলম্বনে রচিত প্রেম কবিতার ভিতর দিয়া কবিগণ একদিকে দেবলীলা বর্ণনার একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারিতেন, অথচ ইহার ভিতর দিয়া মনুষ্য-প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রস বিচিত্র লীলাকে রূপ দিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সুযোগ পাইতেন । এইভাবেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম কবিতার ক্রম – প্রাধান্য ।''

(''শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ৩য় সং, পৃঃ ১৪৭)

কৃষ্ণ কর্ণামৃতে লীলাশুক কবি রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে একটা তাত্ত্বিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন । গীতগোবিন্দের কবি রাধা – কৃষ্ণ প্রেমকে প্রাকৃত প্রেমের উপরেই ভিত্তি করে তুলে ধরলেও রাধা – কৃষ্ণ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন । বিদ্যাপতিও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বলিষ্ঠতা প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণ কথার রূপকে । একদিন কানু ছাড়াই গীত ছিল । এবার থেকে সব গীতই কানুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে লাগল । মর্ত ও স্বর্গের মিলন ঘটানো হল — হরিস্মরণ ও বিলাস কলার কৌতূহল একসাথেই দেখতে পেলাম ।

এর পর এলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু । স্পর্শে তাঁর লোহা হ'ল সোনা । 'গীতগোবিন্দ', বিদ্যাপতির পদ তাঁর কাছে পেল নোতুন অধ্যাত্ম উপলব্ধির ব্যঞ্জনা । বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে বৈষ্ণব দর্শন যুক্ত হবার কাল হল সমাগত ।

চৈতন্য দেবের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে কাম ও প্রেমের মধ্যে বেশী তফাত ছিল না । বৃন্দাবনে 'ষড় গোস্বামী' চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্মের একটা দার্শনিক রূপ ঠিক করে দিয়েছিলেন । সেই পথেই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা ধাবিত হয়েছিল ।

"It was the inspiration and teaching of the six Pious and scholarly Gosvāmins which came to determine finally the doctrinal trend of Bengal vaisnavism which, however modified and supplemented in later times, dominated throughout its subsequent history." (S. K. De - Vaisnava Faith and movement", 2nd edition).

রাধাপ্রেমের [illegible] মোটামোটি কাঠামোটি পূর্ববর্তী প্রেম কবিতা থেকে গৃহীত হলো । রাধার বয়ঃসন্ধি, প্রেম-চাঞ্চল্য, মান অভিমান ও প্রেম বর্ণনার কলাকৌশল গুলোও পূর্ববর্তী প্রেম কবিতারই দান — একথা বলা বেশী অত্যুক্তি নয় । চৈতন্যদেবের 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' জীবন, ষড় গোস্বামীর বিভিন্ন রসশাস্ত্র ও সন্দর্ভ প্রেমের সূক্ষ্মতার দিকে কবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল । একদিকে প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহকে প্রাধান্য দেবার ফলে ও তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'প্রাকৃত মর্ত ভূমি' থেকে 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামে' বৈষ্ণব কবিতা যাত্রা করেছে । এইভাবে একদিনের মানবী প্রেম পরবর্তী সময়ে রাধা প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে ।

শ্রীরূপ তার ''পদ্যাবলী''তে একান্ত মানবীয় প্রেমের কবিতা ও 'অথ রহস্যানুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং বলে গ্রহণ করেছেন । ''কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'' এবং সদুক্তি কর্ণামৃতে অজ্ঞাত নামা কবির একটি অসতী প্রেমের কবিতার কথা ধরাযাক ।

''যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তাশ্চ চন্দ্রগর্ভা নিশাঃ
প্রোন্মীলন্নবমাধবী সুরভয়স্তে তে চ বিন্ধ্যানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরতব্যাপারলীলাভৃতাং
কিং মে রোধসি বেতসী বনভুবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥
('কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' — ধৃত পাঠ)

এই কবিতাটিকে আধ্যাত্মিক অর্থে কিঞ্চিত পরিবর্তিত আকারে শ্রীরূপ গোস্বামী ''পদ্যাবলী'' তে তুলে ধরছেন । সুতরাং বলা চলে, মানবীয় প্রেমের কবিতাই ধর্ম ও দর্শনকে অবলম্বন করে বৃন্দাবনের কল্প লোকে যাত্রা করেছে । প্রাচীন ভারতীয় প্রেম – কবিতার উৎকর্ষ বৈষ্ণব – কবিরা যোগ্য উত্তরসাধকের মত গ্রহণ করেছিলেন । তাই পরবর্তী কালেও বৈষ্ণব – কবিতা ধর্ম – সংগীত হয়েও এই মানবিক প্রেম ঐশ্বর্যের গুণেই অবৈষ্ণব কবিতায় তার অবিসংবাদি প্রভাব রেখে গেছে ।